গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬২ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ৮ - ১৫ জুলাই, ২০১০ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

কাশ্মীরের জনগণের উপর বর্বর অত্যাচার বন্ধ করার দাবি জানালেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

গত বেশ কয়েকদিন ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীর উপত্যকার নানা স্থানে যেভাবে কিশোরসহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে একের পর এক হত্যা করছে, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩০ জুন এক প্রেস বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিযুক্ত করে তিনি বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের উপর বর্বর উৎপীড়ন চালানোর নীতি কেন্দ্রীয় সরকার বহুকাল ধরেই অনুসরণ করে চলেছে — যেখানে ধর্ষণ, নৃশংস অত্যাচার, নিরপরাধ নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা, বহু মানুষের রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, ভুয়া সংঘর্ষের আড়ালে বন্দি হত্যা ইত্যাদি কোনও কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

এই হিংস্র সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি অবিলম্বে পরিত্যাগ করার, সকল প্রকার নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করার এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত অমীমাংসিত সমস্যা আলোচনার মধ্য দিয়ে মীমাংসা করার জন্য যথার্থই আন্তরিক উদ্যোগ নিতে কমরেড প্রভাস ঘোষ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। সেজন্য সংবিধানের ৩৭০ ধারার সম্পূর্ণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন, শের-ই-কাশ্মীর শেখ আবদুল্লার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত জম্মু-কাশ্মীরের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার প্রতি প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েই স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ৩৭০ ধারা যুক্ত করা হয়েছিল।

বাজেট ঘাটতির দায় সংকটে জেরবার জনগণ বহন করবে কেন

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ভারতব্যাপী বনধের সাফল্য দেখে দিশাহারা কংগ্রেস সরকার প্রশ্ন তুলেছে, পেট্রোপণ্যে ভরতুকি বজায় রেখে ঘাটতি মিটবে কী করে? যেন কোষাগারের বিপুল ঘাটতি পেট্রোপণ্যের দাম না বাড়ানোর জন্যই ঘটেছে। এ ভাবেই নির্লজ্জ সরকার ঘাটতি মেটাবার দায় চাপিয়ে দিচ্ছে জনগণের উপর। কিন্তু জনগণ তা মেটাবে কেন? সরকার তো জনগণকে অবিরাম মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি ও দারিদ্রের বোঝা ছাড়া কিছুই দেয়নি। তা ছাড়া, কোষাগার ঘাটতির জন্য তো সরকারের পুঁজিপতি তোষণ নীতিই দায়ী। আসলে সরকার কালা মুখ ঢাকতে লোকঠকানো মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে। যেমন এবার থেকে পেট্রোপণ্যের দাম নির্ধারণ করবে বিশ্ববাজার— এই অজুহাতে ডাহা মিথ্যার আড়ালে পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস এমনকী দরিদ্রতম মানুষের ব্যবহার্য কেরোসিন তেলেরও বিপুল মূল্যবৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। গত লোকসভা নির্বাচনের পর এক বছরে কংগ্রেস এই নিয়ে পর পর দু'বার তেলের দাম বাড়াল। এবার তারা শুধু দামই বাড়ায়নি, সাথে সাথে বাজারের দোহাই দিয়ে তেলের দাম নির্ধারণের ক্ষমতাও তুলে দিল একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলির হাতে। বেশ কয়েক বছর ধরেই তারা তেলের দামের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার অজুহাত খুঁজছিল। ২০০৭ সালে এক ব্যারেল (১৫৯ লিটার) অশোধিত তেলের দাম ১০০ ডলারে পৌঁছেছিল, তা কমে গড়ে ৭৫/৭৬ ডলারে দাঁড়িয়েছে। মন্দার চাপে যখন বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম কমের দিকে সেই মওকায় সরকারের এই সিদ্ধান্ত দেখিয়ে দিচ্ছে, যে কোন উপায়ে বিশ্বায়নের শর্তানুসারে পেট্রোপণ্যের দামের ওপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়াই তাদের লক্ষ্য। সরকার পরিষ্কার বলছে, বিনিয়ন্ত্রণের এটাই সঠিক সময় ও সুবর্ণ সুযোগ। তেলের দামে

আটের পাতায় দেখুন

৫ জুলাই কলকাতার বিক্ষোভ মিছিল থেকে এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে আরও ১৪৮ জন এস ইউ সি আই (সি) কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, শ্রমিক নেতা দিলীপ ভট্টাচার্য সহ ১৪৯ জন কর্মী গ্রেপ্তার

৫ জুলাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে ১২ ঘণ্টার ভারত বনধের সমর্থনে সকল রাজ্যেই পার্টি কর্মীরা ব্যাপক প্রচারে পথে নামে। এ রাজ্যের সমস্ত জেলায় মিছিল, স্কোয়াড, পোস্টার, অটো-প্রচার ও লক্ষ লক্ষ হ্যান্ডবিল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান পৌঁছে দিয়েছেন কমরেডরা। প্রায় সর্বত্রই জনগণের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, সিপিএম নেতারা বনধ ডেকে দিয়েই দায়িত্ব সেরেছেন। প্রচারে তাঁদের কর্মীদের প্রায় দেখাই যায়নি। তুলনায় এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের রাস্তায় উপস্থিতি ও প্রচার ছিল নজরকাড়া।

৫ জুলাই সকাল থেকেই রাজ্যের সর্বত্র এস ইউ সি আই (সি)-র মিছিল দেখা গেছে। বেলা ১০টায় কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে স্লোগান মুখর, দাবি ব্যানার ও পোস্টারে সুসজ্জিত একটি বড় মিছিল সাংসদ তরুণ মণ্ডল ও শ্রমিক নেতা দিলীপ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ধর্মতলায় পৌঁছে রাজভবনের দিকে যাওয়া শুরু করতেই পুলিশ তরুণ মণ্ডল ও দিলীপ ভট্টাচার্য সহ ১৪৯ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে লালবাজার লকআপে সারাদিন বন্দী রাখে। এ ভাবে শান্তিপূর্ণ মিছিল থেকে সাংসদ তরুণ মণ্ডল সহ অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ দেখান এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা।

জনগণের দাবিতে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব

বললেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু

৫ জুলাই বিকালে দলের রাজ্য দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ভারত বনধ সফল করার জন্য রাজ্যের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,

আমাদের পার্টি মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বেশ কিছু দিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেই আমরা এক কোটি ৩৭ লক্ষ স্বাক্ষর নিয়ে রাজ্যপালের কাছে জমা দিয়েছি। যার প্রধান দাবিই ছিল মূল্যবৃদ্ধি রোধ। তারপরও জেলায় জেলায় আন্দোলন হয়েছে। রাইটার্সের সামনে বিক্ষোভও হয়েছে। আইন অমান্য হয়েছে। তার উপর পুলিশি অত্যাচার হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির রোধের সাথে এখন

সফল ভারত বনধ

আমরা আরও চারটি দাবি যুক্ত করেছি। এগুলি হল, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়া ও যৌনশিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত বাতিল, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, ১০০ দিনের কাজ, রেশন কার্ড দেওয়া এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার করা।

ইতিমধ্যে পেট্রোপণ্যের দাম সরকার ব্যাপক আকারে বাড়িয়ে দিল কতকগুলো লোকঠকানো কথা বলে। সরকারের এই দামবৃদ্ধির পিছনে মূল উদ্দেশ্য হল, মন্দার অজুহাতে সরকার পুঁজিপতিদের যে চার লক্ষ কোটি টাকা রাজকোষ থেকে ভরতুকি দিয়েছে, তা উসুল করা। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি যেদিন সরকার এই মূল্যবৃদ্ধি ঘোষণা করে সেদিনই আমাদের কর্মীরা প্রতিবাদ করে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই আমরা পেট্রোপণ্যের বর্ধিত মূল্য ও কয়লার উপর চাপানো সেস প্রত্যাহারের দাবির সঙ্গে মজুতদার ও কালোবাজারিদের গ্রেপ্তারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা এবং ভোপাল গ্যাসকাণ্ডের দোষীদের শাস্তি ও মূল আসামী ওয়ারেন অ্যান্ডারসনকে যেভাবে কংগ্রেস, বিজেপি এবং সিপিএম সমর্থিত ইউ পি এ সরকার সকলেই অভিযোগ থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছে, তার বিরোধিতাকে যুক্ত করে আমরা ভারত বনধের ডাক দিই। আজ দিল্লি, বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরালা, আসামে আমাদের কর্মীরা বনধ পালন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন, কলকাতায় দলের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল সহ ১৪৯ জন কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন। দেশের ২৬টি প্রদেশ ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সহ সর্বত্রই আমরা এই আন্দোলন গড়ে তুলেছি এবং আগামী দিনেও

তিনের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে ৫ জুলাই রাজধানী দিল্লিতে পথ অবরোধ

রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন জনস্বাস্থ্য রক্ষা আন্দোলনের কর্মীরা

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে হাসপাতালগুলিতে ধারাবাহিক আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনে বহু দাবিও আদায় হয়েছে। এই আন্দোলনেরই অঙ্গ হিসাবে **ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে** কমিটির পক্ষ থেকে ২২ জুন হাসপাতাল সেক্রেটারির কাছে ডেপুটেশন দিয়ে দাবি সনদ পেশ করা হয়। ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, ডাঃ সুশান্ত মিত্র, সুমিত্রা মৈত্র প্রমুখের নেতৃত্বে এই ডেপুটেশনে ফ্রি ইমার্জেন্সি চিকিৎসা, দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা সহ দালাল চক্র বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। ২৯ জুন পুনরায় ডাঃ সুদীপ চক্রবর্তী, গোপাল শাসমল ও ডাঃ সুজিত চৌধুরীর নেতৃত্বে সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সুপারকে জানানো হয়, বাথরুম সহ গোটা হাসপাতাল এলাকা অপরিষ্কার থাকে, বিনামূল্যে যে সমস্ত ওষুধ রোগীদের পাওয়ার কথা তা ফিরে যাচ্ছে, চক্ষু দপ্তরে রোগীদের ওষুধ, চশমা ইত্যাদি যা পাওয়ার কথা সেগুলি পাচ্ছে না, এই দপ্তরে ১৫ লক্ষ টাকা দামের গ্রিন লেসার মেশিন সামান্য ত্রুটির জন্য ৪ বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে, রোগী কল্যাণ সমিতির টাকা দুঃস্থ রোগীরা পাচ্ছে না, কর্মচারীদের পরিচয়পত্র না থাকায় রোগীরা দালাল চক্রের হাতে পড়ছে ইত্যাদি নানা অব্যবস্থার কথা। তিনি অবিলম্বে এই দাবিগুলি পূরণের

প্রতিশ্রুতি দেন।

বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নানা অব্যবস্থা প্রতিকারের দাবিতে ও এমারজেন্সি, অর্থোপেডিক্স ও গাইনি ওটি ২৪ ঘণ্টা খুলে রাখার দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ২৩ জুন হাসপাতাল সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ডাঃ সুদীপ দাস, ডাঃ নীলরতন নাইয়া, প্রণতি কর। তাঁরা রোগী কল্যাণ সমিতির সমস্ত হিসেব জনসমক্ষে প্রকাশ করা সহ জীবনদায়ী ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়ার দাবি জানান। সুপার দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে দ্রুত কার্যকর করার আশ্বাস দেন।

এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে কমিটির পক্ষ থেকে সুপারের কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। তখন হাসপাতালের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে হাসপাতালে দালাল চক্র বন্ধ, পূতিগন্ধময় পরিবেশ মুক্ত করা, অপারেশন থিয়েটারের পরিবেশ উন্নত করা সহ নানা দাবি পেশ করা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডাঃ তিমির দাস, স্বপ্না দাশগুপ্ত, ডাঃ নীলরতন নাইয়া, পিন্টু মাইতি প্রমুখ।

মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ওষুধ, এক্স-রে প্লেট নেই। নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। আউটডোর ঠিক সময়ে কোনও দিনই বসে না। এ রকম ১১ দফা সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবিতে ২৮ জুন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি হাসপাতাল সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেয়। উপস্থিত রোগীদের আত্মীয়-স্বজনরাও বিক্ষোভে সামিল হন। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীকান্ত দাস, পদ্মা দাস, অনুপ সিনহা ও ডাঃ এম এ সবুর। সুপার ওষুধ, এক্স-রে প্লেট, পরিশ্রুত পানীয় জল সাতদিনের মধ্যে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

সিউড়ি সদর হাসপাতালে ৩০ জুন কমিটির পক্ষ থেকে সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কমিটির সদস্যরা ছাড়াও রোগী ও তাঁদের পরিবারের লোকেরা এই ডেপুটেশনে যোগ দেন। পানীয় জলের সমস্যা, পরিচ্ছন্ন রাখা, সমাজবিরোধী ও দালাল চক্রের দৌরাত্ম বন্ধ করা, আউটডোরে চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি সহ অন্যান্য দাবি জানানো হয়। সুপার দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন স্বাতী পাল, কল্যাণ মণ্ডল, হেমন্ত রবিদাস প্রমুখ।

নদীয়ার বিভিন্ন মহকুমা হাসপাতাল ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অব্যবস্থা নিয়ে কমিটির পক্ষ থেকে ১০ দফা দাবিতে ২ জুলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল, জেলা হাসপাতালে আউটডোর ও ইনডোর একই জায়গায় করতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবনদায়ী ওষুধ, সাপ ও কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ রাখতে হবে, জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন বাতিল করে পর্যাপ্ত ডাক্তার ও স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করতে হবে, আউটডোরে ডাক্তারদের নির্দিষ্ট সময়ে

২ জুলাই নদীয়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন

উপস্থিত হতে হবে প্রভৃতি। সংগঠনের জেলা সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তীর নেতৃত্ব ৬ জনের এক প্রতিনিধি দল সি এম ও এইচের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। ডেপুটেশনের আগে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন অঞ্জন মুখার্জী, জগন্নাথ ঘোষ, জয়দীপ চৌধুরী, অমরেন্দ্র নাথ সরকার প্রমুখ।

পুরুলিয়ার হুড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও চাটুমাদার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য শেড তৈরি, চাটুমাদার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য মঞ্জুর হওয়া ১০ লক্ষ টাকার হিসাব জনগণকে দেওয়া এবং বিশপুরিয়া অঞ্চলে একটি পি এইচ সি চালু সহ ১৫ দফা দাবিতে ২৫ জুন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এর আগে ২১ জুন বিশপুরিয়া আঞ্চলিক সম্মেলনে যুধিষ্ঠির মাহাতোকে সভাপতি এবং দুর্গাচরণ মাহাতোকে সম্পাদক করে ২১ জনের হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। ২৫ জুন প্রায় দুই শতাধিক মানুষ মিছিল করে বিক্ষোভ সমাবেশে আসেন। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া, হুড়া ব্লক কমিটির সম্পাদক বিনোদবিহারী মণ্ডল, জেলা কমিটির সদস্য শীলা মাহাতো। ব্লক আধিকারিকরা বেশ কয়েকটি দাবি মেনে নেন এবং বাকিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর আশ্বাস দেন। আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু জনসমক্ষে জানান হুড়া ব্লক কমিটির সভাপতি শতদল মাহাতো।

চা শ্রমিক নেতা কমরেড রামপ্রতাপ বড়াইকের জীবনাবসান

জলপাইগুড়ি জেলার চা-শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, নর্থ বেঙ্গল টী প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সহ সভাপতি এবং পার্টি সদস্য কমরেড রামপ্রতাপ বড়াইক দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২৪ জুন নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

রামঝোরা চা বাগানের শ্রমিক কমরেড রামপ্রতাপ বড়াইক ১৯৬৮-'৬৯ সালে প্রয়াত কমরেড উৎপল রায়ের মাধ্যমে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন। চা-শ্রমিকদের মধ্যে এই চিন্তাধারার ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য হাতে গোনা যে ক'জন শ্রমিক প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন কমরেড রামপ্রতাপ বড়াইক তাঁদের অন্যতম। মালিকপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির প্রচণ্ড বাধা এমনকী সশস্ত্র আক্রমণের মোকাবিলা করে ১৯৭৫ সালে রামঝোরা চা বাগানেই প্রথম নর্থ বেঙ্গল টী প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সংগঠন তৈরি হয়। পরবর্তীকালে অন্যান্য চা-বাগানে সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও কমরেড রামপ্রতাপ বড়াইক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সুবিধাবাদ-সংস্কারবাদের কবল থেকে মুক্ত করে বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলনকে দাঁড় করানোর গুরুত্ব সম্পর্কে কমরেড রামপ্রতাপ বড়াইক অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। একটি কথা তিনি প্রায়ই বলতেন, "এই পার্টিটাই যে মজদুরের নিজের পার্টি বেশিরভাগ মজদুররা তা এখনও জানে না। কিন্তু মালিকরা ঠিক জানে সে কথা। সেইজন্যই কোথাও সংগঠন গড়তে গেলে আমাদের বিরুদ্ধে এত আক্রমণ। মজদুরকে এই সত্যটা বোঝাতে পারলে তবেই সংগঠন বাড়বে। কেবল দাবি-দাওয়ার কথা বললে চলবে না, রাজনৈতিক শিক্ষাটা দিতে হবে।"

২০০২ সালে রামঝোরা সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু চা-বাগান বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকরা প্রচণ্ড দুর্দশার মধ্যে পড়েন। অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় কয়েক হাজার শ্রমিক মারা যান। সেই সময় টাকার থলি হাতে নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিশেষ একটি দল রামঝোরায় আমাদের সংগঠন ভাঙার অপপ্রয়াস চালায়। নিজে অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে থেকেও কমরেড বড়াইক সংগঠন টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে এক শ্রমিকের মন্তব্য 'লোভ নামক জিনিসটাই তাঁর ছিল না।' সততার এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেছেন। অমায়িক ও মধুর ব্যবহারের দ্বারা মানুষকে তিনি সহজেই কাছে টেনে নিতে পারতেন।

কিছুকাল যাবৎ কিছু বিভেদকামী শক্তি যেভাবে চা-বলয়ে সক্রিয় হয়ে উঠছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক ঐক্যকে অটুট রাখার জন্য অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থায়ও নিজের পুত্রের সাথে তিনি দল ও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন। মৃত্যু আসন্ন জেনে তাঁর স্ত্রীকে তিনি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন যে, দল যেভাবে চাইবে সেভাবেই যেন তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর এলাকায় এবং দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য হাসপাতালে প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করেন ও লাল সেলাম জানান। তারপর তাঁর মরদেহ তাঁর কর্মস্থল রামঝোরা বাগানে নিয়ে আসা হয়। এখানে দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জীবন সরকার ও কমরেড সুজিত ঘোষ, কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন। ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহসম্পাদক কমরেড গোপীনাথ ছেত্রী, সহসম্পাদক কমরেড অভিজিৎ রায়, কোষাধ্যক্ষ কমরেড লালাকাঞ্জা লামা ও অন্যান্যরাও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র অন্যান্য সকলের সাথে প্রয়াত কমরেডের প্রতি লাল সেলাম জানান। এরপর প্রয়াত কমরেডের মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

১০ জুলাই রামঝোরা চা-বাগানে ও ১৮ জুলাই বীরপাড়ায় প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে।

কমরেড রামপ্রতাপ বড়াইক লাল সেলাম

ভারত বনধে জেলায় জেলায় এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা ছিলেন সক্রিয়

ওপরে কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে হাজরায় বিক্ষোভ মিছিল, মাঝে বেহালায় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল এবং নিচে বহরমপুরে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হচ্ছে

ওপরে বনধের সমর্থনে হাবড়ায় মিছিল, মাঝে মেদিনীপুরে বিক্ষোভ মিছিল এবং নিচে হাওড়া জেলা সম্পাদক কমরেড দেবাশিস রায়ের নেতৃত্বে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল।

বিজেপি, সিপিএমের ধর্মঘট ডাকার নৈতিক অধিকার নেই

একের পাতার পর

এই আন্দোলন চলবে।

কেন আমরা সরকারের বক্তব্যকে প্রতারণামূলক বলছি? সরকার বা কোম্পানিগুলি যে হিসাব দিচ্ছে তাতে প্রতি ব্যারেলে ৪২ গ্যালন বা ১৫৮.৭০ লিটার অপরিশোধিত তেল থাকে, এক ব্যারেলে দাম বিশ্ববাজারে এখন বেড়ে যা হয়েছে তাতে লিটার প্রতি দাম পড়ে ২২.২৪ টাকা। রিফাইনিং খরচ ধরে লিটার প্রতি পেট্রলের দাম পড়ছে ২৩.৭৬ টাকা। সেটা কলকাতায় দাম হয়েছে ৫৫.৩২ টাকা। এই দ্বিগুণ দামের কারণ কেন্দ্র সরকার পেট্রোপণ্যের উপর ১০০ টাকায় ৩৮ টাকা কর নিচ্ছে। রাজ্য সরকার নিচ্ছে কর ও সেস মিলিয়ে ১৭ টাকা। যে সরকার পুঁজিপতিদের জন্য বিপুল পরিমাণ ভরতুকি দিচ্ছে, তারা কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য তেলের ট্যাক্স কমাচ্ছে না। তেল কোম্পানিগুলি লাভ করছে প্রচুর, অথচ সরকার প্রচার করছে যে, লোকসান হচ্ছে। এর তীব্র প্রতিবাদ হওয়া দরকার ছিল।

সিপিএম-বিজেপি প্রভৃতি দলগুলো নিজেরা যে রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে তারা ট্যাক্স নিচ্ছে। কালোবাজারিদের প্রশ্রয় দিচ্ছে।

সৌমেন বসু

তেলের দাম বাড়ার সাথে সাথে ডাল সহ অনেক জিনিসের দাম কেজিতে ৫ টাকা করে বেড়ে গেছে। এর মধ্যেই কালোবাজারিরা বিপুল মুনাফা করে নিয়েছে। কেন্দ্র-রাজ্যের কোনও সরকারই একজনও কালোবাজারির কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি। এ রাজ্যে আলুচাষিরা এক টাকা কেজি দরে যে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে, ব্যবসাদাররা তা ২০-২২ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেছে। নপুংসক সরকার হাতকাটা পুতুলের মতো বসে রয়েছে। তাই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিপিএমের 'আন্দোলন' করার কোনও নৈতিক অধিকার নেই। অ্যান্ডারসনকে গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে বিজেপি এবং সিপিএম সমর্থিত ইউপিএ সরকার কোনও ভূমিকাই পালন করেনি। রাজীব গান্ধি যে এর সঙ্গে যুক্ত, তা ভারতে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও বিদেশ সচিবের বক্তব্যেও উঠে এসেছে। ফলে কংগ্রেসের এ নিয়ে কোনও কথা বলাই সাজে না। এই অবস্থায় আমরা বনধ ডাকতে বাধ্য হয়েছি।

ইদানীং ধর্মঘট-বনধের বিরুদ্ধে খুব প্রচার করা হচ্ছে, সংবাদপত্রের মালিকরা কোটি কোটি টাকা ব্যবসার অংশীদার আমরা জানি, তারা মানুষের প্রতিবাদ জানানোর অধিকার খর্ব করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে, অন্যান্য শক্তিও আছে। সাধারণ ধর্মঘট করার জন্য এ রাজ্যেই হাইকোর্টে মামলা করে আমাদের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদককে আসামী হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছিল, আপনারা জানেন। জনসভা করার ক্ষেত্রেও নানা ধরনের সঙ্কোচন নীতির প্রয়োগ করা হচ্ছে। পোস্টার মারা নিয়েও নানা ধরনের কথা বলা হচ্ছে। গরিব মানুষের বনধে অসুবিধা হয় আমরা জানি, আমরা তা অনুভব করি। কিন্তু আমরা এটাও জানি, পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত যত পরিবর্তন, তার জন্য যে আন্দোলন, তাতে কোনও মানুষের কোনও কষ্ট হবে না, এটা হতে পারে না।

সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা তো জনগণেরই অংশ, মূল্যবৃদ্ধির বোঝা আপনাদের জীবনেও সঙ্কট সৃষ্টি করছে, তাছাড়া আপনারা চাকরি করেন, সেখানে মালিকী অত্যাচার আছে, যেকোনও সময় চাকরির উপর আঘাত আসতে পারে। তখন আপনাদেরও আন্দোলন-ধর্মঘটে যেতে হবে। ফলে এই বনধবিরোধী, আন্দোলনবিরোধী প্রচার গণতান্ত্রিক অধিকারের উপরই একটা ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণ, যার বিরুদ্ধে আপনাদেরও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে যাওয়া দরকার। এই আবেদনটা আমি আপনাদের কাছে রাখছি।

আসামের লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু জনগণের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র

আসামে সংখ্যালঘু মানুষদের বিদেশি বানিয়ে বিতাড়নের নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষে নাগরিকপঞ্জী (সিটিজেন্স রেজিস্টার) প্রণয়নের কোনও কার্যক্রম গৃহীত না হলেও সম্প্রতি কেবলমাত্র আসামে নাগরিকপঞ্জী প্রণয়নের এক দুরভিসন্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই নাগরিকপঞ্জী প্রণয়ন করতে গিয়ে সারা ভারতবর্ষের নাগরিকপঞ্জী প্রণয়নের জন্য যে বিধি, তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে আসামের জন্য এক পৃথক আধারনীতি (বেসলাইন) রচনা করা হয়েছে। এই পৃথক আধারনীতি রচনার পেছনকার ঘটনা হল, ২০০৫ সালের ৫ মে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আসাম রাজ্য সরকার আসামের উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী ছাত্র সংগঠন আসু-র (অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন) সাথে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হয়ে তাদের দাবি মেনে নিয়ে আসামে নাগরিকপঞ্জী প্রণয়নের জন্য নতুন আধারনীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৯ সালের ৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে আসামের নাগরিকপঞ্জী প্রণয়নের নতুন আধারনীতি ঘোষণা করে। এই বিজ্ঞপ্তিতে সারা ভারতের জন্য প্রচলিত নাগরিকপঞ্জী প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান বিধি ২০০৩-এর ৪নং ধারা, যে ধারায় নাগরিকপঞ্জী প্রণয়ন করার প্রশ্নে ঘরে ঘরে গিয়ে নাম অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লেখিত রয়েছে, তাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে বলা হয়েছে যে, সবাই নতুন করে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার পর ১৯৫১ সালের নাগরিকপঞ্জী ও ১৯৭১ সালের পূর্বের অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। আরও বলা হয়েছে যে, এই প্রাথমিক তালিকায় যাদের নাম উল্লেখিত হবে না, তাদের, এমনকী উল্লেখিত তালিকায় নাম থাকা নাগরিকদের সন্তান-সন্ততিদেরও সমস্ত নথিপত্র দিয়ে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে এবং শুনানির পর কর্তব্যরত অফিসাররা সন্তুষ্ট হলে তাদের নাম নাগরিক হিসাবে নথিভুক্ত করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসাধারণের মনে গভীর ক্ষোভ ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠছে যে, নাগরিকপঞ্জী প্রণয়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন অংশের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কোনও মতামত গ্রহণ না করে শুধুমাত্র আসু-র সাথে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হয়ে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এরকম একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল কেন? এর পেছনে কী অভিসন্ধি লুকিয়ে রয়েছে?

প্রাদেশিকতায় বিষাক্ত আসাম আন্দোলনের ঘটনাবলী

এই ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন দিক সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে ১৯৭৯ সালের শেষের দিক থেকে আসামে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের দ্বারা তথাকথিত বিদেশি বিতাড়নের নামে পরিচালিত আসাম আন্দোলনের ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকা দরকার। আসাম আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে বিগত ৩১ বছর ধরে আসামে সংখ্যালঘুদের উপর এক দুর্বিষহ ঝড় বয়ে চলেছে। কখন বিদেশি বানিয়ে দেওয়া হয়, কখন এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, এরকম একটা আশঙ্কা ও সন্ত্রাসের পরিবেশ বিরাজ করছে। এই আশঙ্কা সংখ্যালঘু জনসাধারণের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এই উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীরা সেদিন নেলী, চাউলখোয়া, মুকালমুয়া, গহপুর ইত্যাদি অসংখ্য জায়গায় হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবনিতাকে নারকীয়ভাবে হত্যা করে তাদের আন্দোলন শুরু করেছিল। সেদিন তারা দাবি করেছিল যে, আসামে ৪০/৫০ লক্ষ বাংলাদেশি রয়েছে। আজ আসামে সংখ্যালঘু জনগণের সংখ্যা ৯০ লক্ষের কাছাকাছি। ৩০/৩৪ বছর পূর্বে সেদিন এই সংখ্যা আনুমানিক ৫০/৬০ লক্ষের মতো ছিল। স্পষ্টতই আসু প্রায় সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে বিদেশি আখ্যা দিয়ে তাদের জাতিবিদ্বেষী মানসিকতারই প্রকাশ ঘটিয়েছে। আসু, এ জি পি, বিজেপি আর এস এস সহ সমস্ত উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের লক্ষ্য হচ্ছে পারলে সমস্ত সংখ্যালঘু জনগণকে বিদেশি বানানো। প্রফুল্ল মহন্ত, ভৃগু ফুকনের নেতৃত্বে আসুর দাবি ছিল, ১৯৫১ সালকে বিদেশি সনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ করতে হবে। তারা মনে করেছিল, ১৯৫১ সালকে বিদেশি সনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ করলে তারা তাদের লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে। তাই তারা এই দাবিতে অনড় ছিল।

এই সর্বনাশা উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী জাতিবিদ্বেষী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মুখ্যত এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে আসামে সেদিন সাত পার্টির এক যৌথ মঞ্চ গড়ে উঠেছিল। সিপিএম, সিপিআই, আরসিপিআই, কংগ্রেস(স) এবং অন্যান্য কয়েকটি দল এই সাত পার্টির মঞ্চে সামিল হয়েছিল। তাদের আসার কিছু কারণও ছিল। আসু-র আন্দোলন ছিল একটি আধা ফ্যাসিবাদী চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন। কেবল সংখ্যালঘু জনগণ নন, বামপন্থী দলের কর্মীরাও সেদিন তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। সাত পার্টির মঞ্চ থেকে সেদিন দাবি উঠেছিল, ভারতীয় সংবিধান, নাগরিকত্ব আইন, ইন্দিরা মুজিব আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং দেশ বিভাগের সময়ের জাতীয় প্রতিশ্রুতিকে বিবেচনায় নিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকে বিদেশি নাগরিক সনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ হিসাবে গণ্য করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই যুক্তি ও দাবি মানতে বাধ্য হয়েছিল। বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিদেশি চিহ্নিত করতে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের দাবিও তুলেছিল সাত পার্টির মঞ্চ। এই দাবিও মেনে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আই এম ডি টি (ইললিগাল মাইগ্রেন্টস ডিটারমিনেশন বাই ট্রাইবুনাল) আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছিল।

আসামের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, আমলা, পুলিশ ইত্যাদির জোরে বলীয়ান হয়ে রাজ্যের উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীরা সেদিন ঘোষণা করেছিল যে, ৪০-৫০ লক্ষ লোককে বাংলাদেশি হিসাবে চিহ্নিত না করলে গোটা আসাম অচল করে দেওয়া হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাত পার্টির আন্দোলনের চাপে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধীর আমলে আসাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুসারে ১৯৭১ সালকে বিদেশি সনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ এবং সংখ্যালঘু জনগণের রক্ষাকবচ হিসাবে আই এম ডি টি আইন মেনে নিতে তারা বাধ্য হয়।

সংখ্যালঘুদের বিদেশি বানানোর ধারাবাহিক চক্রান্ত

১৯৮৫ সালে আসু নেতাদের উদ্যোগে এ জি পি (অসম গণপরিষদ) গঠিত হয় এবং নির্বাচনে রাজ্যের ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় বসে ৪০-৫০ লক্ষ সংখ্যালঘু জনগণকে বিদেশি বানানোর চক্রান্তে তারা নেমে পড়ে। আসামের প্রতিটি থানায় নির্দেশ পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে কয়েক লক্ষ লোকের নামে অভিযোগ দায়ের করলেও শেষ পর্যন্ত ট্রাইবুন্যাল মাত্র কয়েক হাজার লোককে 'বিদেশি' বলে রায় দেয়। তাদের সমস্ত দাবি এইভাবে নস্যাৎ হয়ে যায়। এরপর তারা নতুন চক্রান্ত শুরু করে। এ জি পির শাসনকালে পাঁচবার ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। তাদের শুনানির সম্মুখীন করা হয়। তারা সমস্ত প্রমাণপত্র নিয়ে হাজির হয়। শুনানির কাজে নিযুক্ত অফিসারদের বেশিরভাগই ছিলেন প্রাদেশিকতাবাদীদের বিশ্বস্ত লোক। ফলে নাগরিকত্বের উপযুক্ত প্রমাণপত্র দেখানো সত্ত্বেও অফিসাররা সন্তুষ্ট হয়নি। কারণ একটা দুরভিসন্ধি নিয়ে তাদের শুনানির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত প্রবল জনমতের চাপে তারা খানিকটা পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

কিন্তু সাময়িকভাবে পিছু হঠলেও সংখ্যালঘুদের বিদেশি বানানোর চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি। ১৯৯৭ সালে বিদেশি বানানোর লক্ষ্যে তথাকথিত সন্দেহযুক্ত বা 'ডি' (ডাউটফুল) ভোটার বানানোর অপচেষ্টা শুরু হয়। নাগরিকত্ব নিয়ে অহেতুক সন্দেহ করে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজে নিযুক্ত অফিসাররা তিন লক্ষ সত্তর হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে 'ডি' ভোটার হিসাবে চিহ্নিত করে। ভোটার তালিকায় তাদের নামের পাশে 'ডি' চিহ্নিত করে তাদের ভোটাধিকার হরণ করে নেওয়া হয়। সন্দেহ নিরসন করতে 'ডি' ভোটারদের ট্রাইবুন্যালে পাঠানোর কথা বলা হয়েছিল। তখনও আই এম ডি টি আইন প্রত্যাহার করা হয়নি। এই আইনের অধীনে বিদেশি সনাক্তকরণের জন্য ৩২টি ট্রাইবুন্যাল ছিল। কিন্তু বাস্তবে বিগত ১৩ বছরের মধ্যে এই 'ডি' ভোটারদের প্রায় কাউকেই বিচারের জন্য ট্রাইবুন্যালে পাঠানো হয়নি। যখন চাপ পড়ে তখন একটি বা দুটি পাঠায়। এইভাবেই ওরা ৩ লক্ষ ৭০ হাজার সংখ্যালঘু মানুষের ভোটাধিকার হরণ করেছে। এত কাঠখড় পুড়িয়েও যখন ৫০ লক্ষ সংখ্যালঘু জনগণকে বিদেশি বানাতে পারা গেল না, তখন তারা দাবি তুলল, আই এম ডি টি আইন বাতিল করতে হবে। তাদের দাবি, এই আইনের আওতায় বিদেশিরা না কি সুরক্ষিত। অথচ আই এম ডি টি আইনের প্রতিটি ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই আইন বিদেশি নাগরিক বাছাই করার কথাই বলেছে। আসলে যারা নিশ্চিতরূপে ভারতীয় নাগরিক তাদের বিদেশি বানানোর ক্ষেত্রে অন্তরায় ছিল আই এম ডি টি আইন। এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে এই আইন বাতিল করানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়। এস ইউ সি আই (সি)-র আন্দোলনের ফলে কেবল সংখ্যালঘু জনগণের মধ্যে নয়, অন্যান্য অংশের জনগণের মধ্যেও সাড়া পড়েছিল। ফলে রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার সরাসরি এই আইন প্রত্যাহারের পথে গেল না। বিদেশি বিতাড়নের হোতা আসু, আই এম ডি টি আইন বাতিলের জন্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই আইনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে কোনও বক্তব্য সুপ্রিম কোর্টে রাখল না। কংগ্রেসের এই ভূমিকার ফলে একতরফা বিচারে এই আইন বাতিল হয়ে গেল। বলা বাহুল্য সুপ্রিম কোর্টের এই অভাবনীয় একপক্ষীয় রায়ে উগ্রপ্রাদেশিকতাবাদীরা খুশি হয়েছে ও মদত পেয়েছে, কিন্তু ন্যায় বিচার প্রচন্ডভাবে মার খেয়েছে।

আই এম ডি টি আইন বাতিল হওয়ার ফলে গোটা আসামে আজ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই আইন বাতিলের ফলে বিদেশি নাগরিক আইন (ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬) রাজ্যে প্রয়োগ হল। উল্লেখ করা দরকার যে, ব্রিটিশ শাসনকালে প্রণীত এই আইনে ছিল, দেখামাত্রই চিনতে পারা যায় এমন ভিন্ন দেশের মানুষ, যারা মাঝে মধ্যে উপযুক্ত 'ট্রাভেল ডকুমেন্ট' নিয়ে এদেশে প্রবেশ করতেন, তাদের নিজ নিজ দেশে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। যেখানে এই ধরনের ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও বিতর্কই দেখা দিত না — এটা ছিল সেইভাবেই প্রণীত একটি আইন। এই আইনে বলীয়ান হয়ে বিদেশি অভিযোগে নির্বিচারে যাকে তাকে নোটিশ ধরিয়ে দিতে শুরু করল পুলিশ। পুলিশ অফিসার থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত সবাইকে অভিযোগ উত্থাপনের সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। মামলা দায়ের করার নির্দিষ্ট কোটা পূরণ করতে না পারলে বদলির হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ তাই নতুন করে যাকে তাকে বিদেশি বলে নোটিশ ধরিয়ে দিতে শুরু করেছে। ফলে পূর্বের 'ডি' ভোটারদের পাশাপাশি সন্দেহভাজন বিদেশি নাগরিকদের সংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কেবল গোয়ালপাড়া জেলাতে আনুমানিক ২২ হাজার জনের বিরুদ্ধে এবং ধুবড়ি জেলাতেও ৩০ হাজারের মতো মানুষের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ হেন নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির মুখে সংখ্যালঘু জনগণের কিছু দালাল লোককে দিয়ে প্রচার করানো হল যে, নাগরিকপঞ্জী প্রণয়ন করে সবাইকে নাগরিক প্রমাণপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করলেই সমস্যা চিরকালের জন্য সমাধান হয়ে যাবে। সংখ্যালঘু জনগণের মধ্যে এই মানসিকতার জন্ম দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আসু-র সাথে নাগরিকপঞ্জী প্রণয়ন নিয়ে আলোচনায় বসে নতুন চক্রান্ত শুরু করল।

নাগরিকপঞ্জী প্রণয়নের দাবিদার আসু একসময় আদম সুমারি এবং সচিত্র নাগরিক পরিচয়পত্র দেওয়ার বিরোধিতা করেছিল

১৯৮১ সালে আসু আসামে জনগণনা (সেনসাস) করতে দেয়নি। গোটা ভারতবর্ষে ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হলেও আসুর বিরোধিতায় আসামে তা দেওয়া হয়নি। আসুর বক্তব্য ছিল, সচিত্র পরিচয়পত্র দিলে নাকি বিদেশিরা ভারতীয় নাগরিকের স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। সেদিন যে আসুর নেতারা পরিচয়পত্র দেওয়ার বিরোধিতা করেছিল, আজ তারাই নাগরিকপঞ্জী প্রণয়ন করে সংখ্যালঘু জনসাধারণকে পরিচয়পত্র দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করছে কেন? এর পিছনে রয়েছে এক গভীর ষড়যন্ত্র। অন্য কোনও দলের সঙ্গে বৈঠক না করে কেবল আসুর সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০০৯ সালের ৯ নভেম্বর কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার আসামে নাগরিকপঞ্জী প্রণয়নের যে সিদ্ধান্ত ও তা কার্যকর করার যে প্রক্রিয়া ঘোষণা করে, তার মধ্য দিয়ে এই ষড়যন্ত্রের নীল নক্সা পুরোপুরি ফাঁস হয়ে যায়। এই ঘোষণায়, ভারতীয় সংবিধানকে ভিত্তি করে ২০০৩ সালে রচিত নাগরিকত্ব আইনের ৪নং ধারাকে বাতিল করে কেবলমাত্র আসামের জন্য ৪(ক) নং ধারা সংযোজন করা হয়। নতুন সংযোজিত ধারায় বলা হয়েছে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে নয়, সবাই আবেদন করার পর ১৯৫১ সালের নাগরিকপঞ্জী অথবা ১৯৭১ সালের পূর্বের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে খসড়া নাগরিকপঞ্জী প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সরকার প্রথমে ১৯৫১ সালের নাগরিকপঞ্জীকেই একমাত্র ভিত্তি হিসাবে নির্ধারণ করেছিল। তীব্র প্রতিবাদের পর ১৯৭১ সালের পূর্বের ভোটার তালিকা বিবেচনায় নিতে সম্মত হয়। এই তালিকায় যাদের নাম থাকবে না, তাদের নথিপত্র দিয়ে নাগরিত্ব প্রমাণ করতে হবে। আবেদনপত্রগুলি বিবেচনা করে শুনানির দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসাররা খুশি হলে নাগরিকপঞ্জীতে নাম অন্তর্ভুক্ত হবে, অন্যথায় নয়। ১৯৫১ সালের নাগরিকপঞ্জী সম্পর্কে উল্লেখ করা দরকার যে ১৯৫০ সালে মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর এক বিশেষ পরিস্থিতিতে আসামে ১৯৫১ সালে একটি নাগরিক পঞ্জী প্রণয়ন করা হয়েছিল। এর পর বহুবিধ কারণে আসামের জনবিন্যাস মূলগতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এর ফলে ঐ দলিলটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, এই নাগরিকপঞ্জী সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি। বহু জেলাতেই তা আজ পূর্ণরূপে পাওয়ার অবকাশ নেই।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে, ১৯৮৫ সালে রচিত

ছয়ের পাতায় দেখুন

৫ জুলাই ভারত বনধে রাজ্যে রাজ্যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

ওপরে ৫ জুলাই পাটনায় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল, ওড়িশায় বনধের দিনে রেল অবরোধ

ওপরে ৫ জুলাই বন্‌ধের সমর্থনে হায়দ্রাবাদে এস ইউ সি আই (সি) সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের উদ্যোগে যোথ মিছিল, বাঙ্গালোরে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুলে আগুন দেওয়া হচ্ছে

মুম্বাইয়ে বন্‌ধের প্রচারে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা, গুজরাটে বন্‌ধের প্রচার চলছে।

হরিয়ানায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান সিং-এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল এবং নিচে এলাহাবাদে বিক্ষোভ

আসাম কি ভারতের বাইরে যে নাগরিকত্বের নিয়ম আলাদা হবে?

চারের পাতার পর

আসাম চুক্তিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকে বিদেশি নাগরিক সনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। অথচ এই বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৭১ সালের পূর্বের ভোটার তালিকাকে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করার ভিত্তি হিসাবে বলে, সরকার কার্যত উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের চাপে আসাম চুক্তি থেকে সরে আসতে চাইল। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, দাবি ওঠে ১৯৭১ সালের ভোটার তালিকাকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার চাপে সরকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের কাছে সরকার কতটা আত্মসমর্পণ করেছে, এই ঘটনা তা স্পষ্ট করে দেয়।

১৯৭১ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তিবর্ষ হিসাবে মেনে নিলেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে না। কারণ, ১৯৭১ সালের ভোটার তালিকা পূর্ণাঙ্গ আকারে সরকারের হাতে মজুত নেই। সাত পার্টির অন্তর্ভুক্ত সেই সময়ের কংগ্রেস (স) দলের নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শরৎ সিংহ মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অভিজ্ঞতা থেকে নিজে একথা উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রফুল্ল মহন্তের মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলেও চাপাচাপির ফলে রাজ্য সরকারের তরফে বিধানসভায় বিবৃতি দিয়ে বলা হয় যে, এই দুটো দলিলের পুরোটা তাদের হাতে নেই। গত ৪ জুন আসামের দৈনিক পত্রিকা 'অগ্রদূত'-এও এর সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান কংগ্রেস সরকার তা অস্বীকার করতে পারেনি। তাই বহু জায়গাতেই তা পাওয়ার উপায় নেই, হারিয়ে যাওয়া এই অর্থে কার্যত অস্তিত্বহীন, দুই বা তিন দলিলের উপর ভিত্তি করে যে তালিকা প্রকাশ করা হবে, তার মধ্যে সেই সময়কার সংখ্যালঘু জনগণের মধ্যে যাঁরা এখনও বেঁচে রয়েছেন তাঁদের নাম ও তাদের সন্তান সন্ততি এবং যারা মৃত তাদের সন্তান সন্ততির নাম অন্তর্ভুক্ত হবে না— এই আশঙ্কা সংখ্যালঘু জনগণকে মারাত্মকভাবে আচ্ছন্ন করেছে। ফলে এটা স্পষ্ট যে, নাগরিকপঞ্জী প্রণয়নের কথা বলে সংখ্যালঘুদের কার্যত ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর চক্রান্ত চলছে।

কার্যত অস্তিত্বহীন এই দুই-তিন দলিলকে ভিত্তি করে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও আরও অনেক জটিলতা রয়েছে। ১৯৫১ সালে রচিত নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুত করা হয়েছিল জেলা ভিত্তিক। তখন ছিল অবিভক্ত আসাম, যার মধ্যে মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ইত্যাদি ছিল। কিন্তু এই রাজ্যগুলি সৃষ্টি হওয়ার পর একদা অবিভক্ত আসামের ওই সব অঞ্চলে বসবাসকারী বেশিরভাগ সংখ্যালঘু মানুষ আসামের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের নাম বর্তমান আসামের কোনও জেলার কোনও তালিকায় নেই। তাছাড়া ১৯৫১ সালের পর ৫৮ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে বহু লোককে বন্যা, নদীভাঙন ও জীবিকার সন্ধানে নতুন স্থানে বসতি স্থাপন করতে হয়েছে। তাঁদের নামও বর্তমান বসবাসের জেলার প্রাথমিক তালিকায় উঠবে না। তাই এটা স্পষ্ট যে, ১৯৫১ সালের এন আর সি তে নাম থাকা সত্ত্বেও বহু লোক এবং তাঁদের সন্তান সন্ততিরা নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণের দাবি পর্যন্ত জানাতে পারবেন না। নতুন বিজ্ঞপ্তি মতে যাঁদের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়বে তাঁদের প্রমাণ করতে হবে যে, সেই ব্যক্তি খসড়া তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তির পুত্র, কন্যা অথবা নাতি-নাতনি। একথা সবার জানা যে, গ্রামাঞ্চলে অতীতে জন্মের সময়, নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া ছিল না, আজও তা সুসম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠেনি। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে জন্মের সময় হাসপাতালে খুব কম লোকই যান। তাই তাঁরা প্রমাণ করবেন কীভাবে? এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ১৯৫১ সালের নাগরিকপঞ্জীতে যেসব নাগরিকদের নাম ছিল, তাদের ৯০/৯৫ ভাগই আজ জীবিত নেই। তাঁদের পুত্র-কন্যাদেরও অনেকেই হয়তো মৃত। তাঁদের নাতি-নাতনিরা রয়েছেন। মারাত্মক বিষয় হচ্ছে এখানে প্রয়োজনীয় লিঙ্ক সার্টিফিকেট যা পূর্বে স্থানীয় পঞ্চায়েত দিত, উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের দাবিতে ইতিমধ্যেই তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। অন্যদিকে 'আসু'র দাবি মেনে নিয়ে বলা হয়েছে, অন্যভাবে এই সংক্রান্ত মতপার্থক্যের নিষ্পত্তি না হলে শেষ পর্যন্ত ডি এন এ পরীক্ষার মাধ্যমেই তার নিষ্পত্তি করতে হবে। এই দাবির মধ্যে যে জাতিবিদ্বেষ নিহিত রয়েছে এবং এটা যে সংখ্যালঘুদের প্রতি চরম অবমাননা সূচক তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা। একই সাথে এই দাবির অসারতার দিকটিও লক্ষ্য করা দরকার। যারা মৃত, তাদের রক্তের পরীক্ষা কীভাবে সম্ভব? সেটা না হলে মৃত ব্যক্তিদের বংশধরদের ডি এন এ পরীক্ষার কোনও অর্থ নেই। আসলে এই দাবি তোলাই হচ্ছে, যাতে কেউই ওদের কোপ থেকে বাঁচতে না পারে। এই সমস্ত কথা সরকার জানে। ভারতবর্ষের সংবিধানে, এমনকী যেকোনও সভ্য দেশেই জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রদানের রীতি রয়েছে। একজন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান সন্ততি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ভারতীয় নাগরিক। তাহলে আসামে তাকে নতুন করে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হবে কেন? আসাম কি ভারতের বাইরে?

বিজ্ঞপ্তির ধারাগুলিও বৈষম্যমূলক

এই সিদ্ধান্তের অপর বিপজ্জনক দিকটি হচ্ছে, ১৯৯৭ সালে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে গিয়ে যে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার সংখ্যালঘু জনগণকে 'সন্দেহজনক' নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, বিগত ১৩ বছরে যাদের ট্রাইবুন্যালে পাঠিয়ে কোনও বিচার হল না, সেইসমস্ত লোকের সাথে ইদানিং সময়ে আই এম ডি টি আইন বাতিল হওয়ার পর বিদেশি নাগরিক আইনের অধীনে আরও কয়েক লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পুলিশ দায়ের করেছে, যাদের বিচারও বহু বছর ধরে ঝুলে থাকবে। বুঝতে অসুবিধা নেই যে মুখে স্পষ্ট করে না বললেও এই বিরাট সংখ্যক মানুষ নাগরিকত্বের জন্য আবেদনই করতে পারবে না, আর আবেদন করলেও তা নাকচ হয়ে যাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশে বলা হয়েছে যে, এই নতুন বিজ্ঞপ্তির সমস্ত ধারা আসামের অসমীয়াভাষী, ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বা চা-জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ সমস্তটাই শুধু ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য রচিত। একটা সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিক সংক্রান্ত একটা আইন ধর্মীয় ও ভাষিক জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক হয় কীভাবে? তারপরও কি সরকার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার বলে বিবেচিত হবে?

সংখ্যালঘু সমস্যা নিয়ে অন্যান্য দলগুলির অদ্ভুত নীরবতা

সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এতবড় একটা চক্রান্ত চলছে, অথচ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ছাড়া বাকি সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এই প্রশ্নে নীরব। আই এম ডি টি আইন বাতিল হওয়ার পর সংখ্যালঘুদের মধ্যে সৃষ্ট ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে এবং ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে বদরুদ্দিন আজমল এ ইউ ডি এফ গড়ে তুলে সংখ্যালঘুদের ত্রাণকর্তা হিসাবে নিজেদের জাহির করে বিগত বিধানসভা নির্বাচনে দশ জন বিধায়ক নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি নিজেও পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। অথচ আজ তাঁরা কোনও ভূমিকাই পালন করছেন না। সিপিএম, সিপিআই যারা বিধানসভায়, পার্লামেন্টে কখনও কখনও হইচই করেন তারা এই প্রশ্নে শুধু নীরবই নন বরং একে সমর্থনই করছেন। সংখ্যালঘুদের গলা হাড়িকাঠে ঠেলে দিয়ে ঘটনার রাজনৈতিক মুনাফা নিতে মাঠে নেমে পড়েছে কংগ্রেস, ইউ ডি এফ প্রভৃতি দলগুলো। কংগ্রেস এবং ইউ ডি এফের নেতারা সংখ্যালঘু জনগণকে বোঝাচ্ছে যে, এ নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, কারণ তাঁরা তো রয়েছেন। এমনকী তাঁরা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে মিথ্যা কথাও বলে বেড়াচ্ছেন।

নাগরিকপঞ্জী প্রণয়ন ও জনগণনা — দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া

অতি কৌশলে নাগরিকপঞ্জী প্রণয়নের কাজটা শুরু করা হচ্ছে এমন একটা সময়ে যখন সারা দেশের সাথে আসামেও জনগণনা ও ইউনিক আইডেনটিটি কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জনপঞ্জী অর্থাৎ ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার-এর কাজও আগামী বছরের শুরুতে আরম্ভ হবে। কাজ শেষ হলে এবছরের শেষের দিকে মাল্টিপারপাস ইউনিক আইডেনটিটি কার্ড দেওয়া হবে। তবে এই কার্ড নাগরিকত্ব প্রমাণের দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে না, তা ভারত সরকার সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এটাও জানিয়ে দিয়েছে, সারা ভারতবর্ষে নাগরিকপঞ্জী তৈরি করা হবে না। কারণ তাহলে বিদেশিরা ভারতীয় নাগরিকের স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। কেবল আসামে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে নাগরিকপঞ্জীর কাজ চলছে। এই বিশেষ ব্যবস্থার মানে হচ্ছে, সংখ্যালঘুদের বিদেশি বানানোর চক্রান্ত। সংখ্যালঘু জনগণকে বিভ্রান্ত করতে জনগণনা ও নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুতির কাজ একই সময়ে করা হচ্ছে। জনগণকে তারা বোঝাচ্ছে যে, ঘরে ঘরে গিয়ে তো নাম নেওয়া হচ্ছে। অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে, নাগরিকপঞ্জী প্রণয়ন ও জনগণনা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়া। জনগণনার জন্য বাড়ি বাড়ি যাওয়ার সাথে নাগরিকপঞ্জী প্রণয়নের কোনও সম্পর্ক নেই। জনগণকে অন্ধকারে রেখে, বিভ্রান্ত করে তারা তাদের গলায় ফাঁস লাগাতে চাইছে। ইতিমধ্যে গত ১ জুন রাতে 'পাইলট প্রজেক্ট' নাম দিয়ে বরপেটা ও ছয়গাঁও সার্কেলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নাগরিকত্বের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করা ও জমা দেওয়ার কার্যসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে এতদিন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এই সমস্ত দলগুলির মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে দুটি সার্কেলে ১৯৫১ সালের নাগরিকপঞ্জী, ১৯৬৬ ও ১৯৭১ সালের যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে বহু ক্ষেত্রেই নতুন করে বানানো তালিকা নকল ও বিকৃত হওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই মারাত্মক জন বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

ফলে, একথা আজ স্পষ্ট, লক্ষ লক্ষ লোকের নাগরিকত্ব হরণের চক্রান্তে কেবল আসু, এজিপি, বিজেপি, আরএসএস জড়িত নয়, অনেকেই প্রকাশ্যে বা গোপনে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কেন্দ্র ও রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে ষড়যন্ত্রের জাল রচনা হয়েছে। আসুর লক্ষ্য পূরণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন রাজ্যের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। বামপন্থী হিসাবে পরিচিত সিপিএম, সিপিআই, সিপিআই (এম এল) দলগুলিও মুখে কুলুপ এঁটে প্রাদেশিকতাবাদীদের লক্ষ্যপূরণের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। সংখ্যালঘুদের স্বঘোষিত ত্রাতা বদরুদ্দিন আজমলও এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার বিপরীতে রাজনৈতিক মুনাফা লুঠতে উঠেপড়ে লেগেছেন। বিজেপি, আরএসএসের সঙ্গে এ জি পির কোনও পার্থক্য নেই। এই জাতিবিদ্বেষী, উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী আন্দোলনের প্রধান হোতা ও জন্মদাতা হচ্ছে এ জি পি দল। তারা নেলীসহ অসংখ্য জায়গায় হাজার হাজার সংখ্যালঘু মানুষকে খুন করেছিল। অথচ গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে দল গঠন করে বদরুদ্দিন আজমল ঐ উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী দলের সাথে আঁতাত করেছিলেন। বাইরে সংখ্যালঘুদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলা আর ভেতরে ভেতরে এদেরই সাথে গোপন আঁতাত করা এবং এ পথে এম এল এ-মন্ত্রী হওয়াই যে তার উদ্দেশ্য, এটা স্পষ্ট। নির্বাচনে এজিপির ভরাডুবির ফলে আজমল সাহেবের উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যায়। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সাথে মিত্রতা গড়ে তুলতে চাইলেও তরুণ গগৈ বাধ সাধলেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করে এ জি পি। এই আঁতাত বর্তমানে ছিন্ন হতে চলেছে। এজিপি ভাবতে শুরু করেছে যে, ক্ষমতায় যেতে হলে সংখ্যালঘুদের কিছুটা ভোট পেতে হবে। তাই আজমল সাহেবের সাথে এজিপির গোপনে বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা চলছে। ফলে চক্রান্তের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। তাই আজমল সাহেব নাগরিকপঞ্জীর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে নারাজ।

জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ঘৃণ্য বুর্জোয়া চক্রান্ত

বস্তুত আজ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ছাড়া বাকি সমস্ত দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই চক্রান্তে সামিল। একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) দলই নির্যাতিত সংখ্যালঘু জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। এর সফলতা নির্ভর করছে জনগণের উপর, কারণ আসল শক্তি রয়েছে জনগণের মধ্যেই। কিন্তু জনসাধারণকে লড়তে হবে সঠিক আদর্শ ও নীতির উপর দাঁড়িয়ে। এজন্য চিনতে হবে প্রকৃত শত্রু কে। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আমাদের দল বার বার বলছে যে নীতি যদি সঠিক না হয়, পথ যদি ঠিক না হয় তাহলে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিলেও আন্দোলন সফল হবে না। শত্রু এবং মিত্র সঠিকভাবে চিহ্নিত করাই হল লড়াইয়ের মূল নীতি। শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে মিত্রদের সঙ্গে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলে শত্রুদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে। লড়তে হলে লড়াইয়ের রণনীতি ও রণকৌশল সঠিক হওয়া দরকার। প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে প্রতিপক্ষ কে? দৃশ্যত এজিপি, বিজেপি, আসু, আর এস এস এবং জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে, প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ, যারা এই ষড়যন্ত্রে সামিল। এমনকী বামপন্থী বলে দাবিদার সিপিএম, সিপিআই দলগুলো পর্যন্ত ওদের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলেছে। কিন্তু এই রাজনৈতিক দলগুলোর আড়ালে আসলে কল-কাঠি নাড়ছে ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণী।

অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেরই জানা যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাদের হাতে রয়েছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতের বাইরে থাকতে পারে না। ভারতবর্ষের মতো একটা পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতেই রয়েছে সমস্ত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা। কংগ্রেস, এজিপি, বিজেপির মত দলগুলো হচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণীর রাজনৈতিক ম্যানেজার। পুঁজিপতিদের প্রচার আর টাকার জোরে ওরা রাজনীতি করছে। এমনকী সিপিএম, সিপিআই পর্যন্ত পুঁজিপতিদের প্রচার আর টাকার জোরে রাজনীতি করছে। তাদের কথা মত ওঠাবসা করছে। টাটা, বিড়লা, আম্বানিদের মতো মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই রাজনৈতিক দলগুলোকে পর্দার আড়াল থেকে চালাচ্ছে। তারা সামনে আসছে না। পুঁজিপতিশ্রেণী জানে, গত ৬৩ বছরে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের শেষ রক্তবিন্দু তারা শুষে নিয়েছে। দেশের অর্ধেক মানুষ হয় বেকার, না হয় অর্ধবেকার। ৭০ শতাংশ মানুষ দিনে ২০ টাকার বেশি খরচ করতে অক্ষম। সরকারি তথ্য অনুসারে, দেশের ৪২ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছেন। কিন্তু বাস্তবে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের কাছে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বাঁচার পথ না পেয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ মৃত্যু কামনা করছেন। একটা অসহনীয় পরিস্থিতি দেশের সমস্ত ধর্মাবলম্বী, সমস্ত ভাষাভাষী সাধারণ মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অবস্থাটা এমন নয় যে, পুঁজিপতিরা হিন্দু গরিবদের এই আক্রমণের হাত থেকে বাদ দিচ্ছে। পুঁজিপতিশ্রেণী জানে তাদের অসহনীয় শাসন শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ ফুঁসছেন। সঠিক পথ পেলে মানুষ পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামে এগোবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও একদিন আশঙ্কা করেছিল, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান

সাতের পাতায় দেখুন

জেলায় জেলায় শিক্ষা কনভেনশন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সর্বনাশা শিক্ষানীতি প্রতিরোধে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের প্রস্তুতিতে চলছে জেলায় জেলায় শিক্ষা কনভেনশন। এখানে দেওয়া হল তারই কিছু প্রতিবেদন।

হুগলি

কোন্নগর

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ওপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি যে আক্রমণ নামিয়ে আনছে তার প্রতিবাদে ২৬ জুন কোন্নগর রামেন্দ্র পাঠভবনে একটি শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী ও শিক্ষানুরাগী মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রবীণ অধ্যাপক রবি চক্রবর্তী। সভার আহ্বায়ক বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিলে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটবে, সাধারণ মানুষ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, সমাজে দু' ধরনের নাগরিক সৃষ্টি হবে। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সুভাষ গুহ। প্রস্তাবে বলা হয়, গ্যাটস্-এর শর্ত মেনে পুঁজিপতিদের অলস পুঁজি শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে তাদের মুনাফার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই সরকার ভাল ভাল কথার আড়ালে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ন্যাশনাল কমিশন অন হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ বিল, দি ফরেন এডুকেশনাল ইন্সটিটিউশনস (রেগুলেশন অব এনট্রি অ্যান্ড অপারেশনস্ বিল, ২০১০, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বিল শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই আনা হচ্ছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য এই সর্বনাশা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলতে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও শিক্ষানুরাগী নাগরিককে কনভেনশন থেকে আহ্বান জানানো হয়।

মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষিকা শ্রাবন্তী চক্রবর্তী, অধ্যাপক মলয় রায়, অধ্যাপক অভিজিৎ দত্ত, শ্রীবাসুদেব চক্রবর্তী, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের কোন্নগর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক নিতাই চন্দ্র গাঙ্গুলি, শিক্ষক নেতা সুরজিত দেবরায় প্রমুখ। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা তপন সামন্ত। তিনি বলেন, ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে ঐতিহাসিক ভাষা ও শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রতিভা বসু প্রমুখ বরেণ্য শিক্ষাব্রতীরা। এঁদের উত্তরাধিকার বহনকারী অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে বিশিষ্ট অধ্যাপক ও কবি তরুণ স্যানালকে সভাপতি করে। এই কমিটির নেতৃত্বে এই আন্দোলন চলবে। কনভেনশনের সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, শারীরিক কারণে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও মানসিকভাবে এই আন্দোলনে আমি আছি। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে সভাপতি ও অধ্যাপক প্রদীপকুমার দত্তকে সম্পাদক করে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি কোন্নগর-নবগ্রাম শাখা গঠিত হয়।

সিঙ্গুর

২৭ জুন হুগলি জেলার সিঙ্গুর মহামায়া বিদ্যালয়ে একটি শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রস্তাবে বলা হয়, পরীক্ষা-ভীতি দূর করার নামে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিলে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটবে, মাধ্যমিক শিক্ষার বুনিয়াদ ধ্বংস হবে এবং সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলি সার্টিফিকেট বিতরণ কেন্দ্রে পরিণত হবে। স্কুলগুলিতে জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌনশিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে শিক্ষক নেতা অমিতাভ চৌধুরী বলেন, এই শিক্ষানীতির ফলে যারা বেশি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে তারা ভাল শিক্ষা পাবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সলিলকুমার মণ্ডল, নীলমণি দাস, রামবিলাস দে প্রমুখ। শঙ্কর দাস তাঁর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করে এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানান। প্রধানবক্তা অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য, প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রদীপকুমার দত্ত বলেন, শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সব শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে যেতে হবে। প্রাথমিকভাবে মনে হবে স্বাধীনতার ৬২ বছর পর শিক্ষা মানুষের অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হল। কিন্তু এই আইনানুসারে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে অভিভাবকরা, সরকার নয়। এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তিনি উপস্থিত সকলকে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কাশীনাথ কোলেকে সভাপতি এবং সুকান্ত পোড়েলকে সম্পাদক করে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি সিঙ্গুর থানা শাখা গঠিত হয়।

আরামবাগ

২৭ জুন আরামবাগ বয়েজ হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত শিক্ষা কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন গৌরমোহন মাঝি। আলোচনা করেন দুলাল মাল, অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুজিত পাত্র ও কার্যকরী কমিটির সদস্য পঞ্চানন খাঁ। শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য এই সর্বনাশা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলতে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও শিক্ষানুরাগী নাগরিককে কনভেনশন থেকে আহ্বান জানানো হয়। অধ্যাপক দুলাল মালকে উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি, গৌরমোহন মাঝিকে সভাপতি এবং কালিপদ মালকে সম্পাদক করে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির আরামবাগ শাখা গঠিত হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

২৩ মে কৃষ্ণচন্দ্রপুর বিবেকানন্দ হলে শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক নিতাই মাইতি। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন ব্রজগোপাল হালদার, বক্তব্য রাখেন মনোরঞ্জন নস্কর, আদম সফি মণ্ডল, সুভাষ ঘোষ, ও লক্ষ্মণ মণ্ডল প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ। প্রধান বক্তা ছিলেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ সরকার। আবুল মজিদ হালদারকে সভাপতি,

আটের পাতায় দেখুন

কিছু নেতা কোটিপতি হল, অসমীয়া গরিব মানুষ কী পেয়েছে

ছয়ের পাতার পর

এক হয়ে গেলে তাদের দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। তাই তারা দুই বৃহৎ জনগোষ্ঠী হিন্দু ও মুসলমানকে বিভক্ত করতে চেয়েছিল। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নেই। তাদের উত্তরাধিকারী ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তারা জানে, দেশের হিন্দু-মুসলমান গরিব মানুষের যদি চোখ খুলে যায় এবং তাদের যদি শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে, আর সঠিক বিপ্লবী দল যদি সামনে চলে আসে তা হলে তাদের পালাবার পথ থাকবে না। তাই ঐক্য ভাঙার ষড়যন্ত্র চলছে। প্রতিদিন শোষণের তীব্রতা বাড়ছে, পুঁজিপতিরা গরিব হিন্দুকে, গরিব মুসলমানের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার হাজার একটা ফন্দি আঁটছে। নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে তাদের মূল নীতি হল, দেশের দুই প্রধান জনগোষ্ঠী হিন্দু ও মুসলমানকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দাও। বিভাজন রাজনীতি হচ্ছে পুঁজিপতিদের খেলা। টেলিভিশন চ্যানেল ও পত্র-পত্রিকাগুলিও এই বিভাজনের রাজনীতিতে পুঁজির মালিকদের সাহায্য করছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে আসু, অগপ, বিজেপি, কংগ্রেস ইত্যাদি দলগুলিকে মূল শত্রু মনে হলেও আসলে ওরা পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতের পুতুল। তারা মালিকদের নির্দেশে চলে। পুঁজিপতিদের আজ্ঞাবহ এই দলগুলো অসমীয়াকে বাঙালীর বিরুদ্ধে, বিহারিদের মারাঠীদের বিরুদ্ধে, যেখানে যেভাবে পারা যায় সংঘর্ষে লিপ্ত করে চলেছে। এমনকী হিন্দু জনগণের মধ্যেও জাত-পাতের ধুয়া তুলে বিভাজন করতে চাইছে।

পুঁজিপতিরাই শোষিত মানুষের চরম শত্রু। এই পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে যারা লড়তে চায়, তাদের সাথে মিত্রতা এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পরিপূরক সাংস্কৃতিক মনন গড়ে তোলা জরুরি। এই লড়াই হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের বা বাঙালির বিরুদ্ধে অসমীয়ার নয়। বিগত ৩১ বছর তাণ্ডব চালিয়ে আসামের হাজার হাজার সংখ্যালঘু মানুষের জীবন বিষময় করে ফেলা হয়েছে এবং এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণামে মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে অন্য রাজ্যে যতটুকু আন্দোলন হয়েছে, আসামে সেটুকুও হয়নি। ফলে অন্যান্য রাজ্যে সরকার আন্দোলনের চাপে যতটুকু উন্নয়নের কাজ করতে বাধ্য হয়েছে, আসামের কোনও সরকারের তার কোনও প্রয়োজন হয়নি। সরকারের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ নেই। বিধানসভার ভেতরে নেই, বাইরেও নেই। বাস্তব সমস্যা নিয়ে কোনও কথা নেই। কেবল সমস্ত অবাস্তব অপ্রয়োজনীয় ইস্যু নিয়ে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও অসমীয়া প্রাদেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস লড়েনি

বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন, কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া কিছু হয় না। আসামে সংখ্যালঘু জনগণের উপর যে বার বার আক্রমণ হচ্ছে, এর ভিত্তি খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গোপীনাথ বরদলৈ, নবীন চন্দ্র বরদলৈরা যখন স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তারাও সেদিন আসামের মাটিতে থেকে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদের ভাবধারা নির্মূল করার জন্য কোনও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। বরং লক্ষ করা গিয়েছে যে, তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেস এই ভাবধারার সঙ্গে আপস করেই চলতে চেয়েছে। মানুষের মধ্যে লোকদেখানো ঐক্য গড়ে তুলে ব্রিটিশকে তাড়িয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় পুঁজিপতিদের বসাতে চেয়েছিল কংগ্রেস। সেদিন জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন হিন্দু প্রভাবমুক্ত ছিল না। ফলে জনগণের মধ্যে পৃথক অস্তিত্বের ধারণা সম্পূর্ণ দূর হয়নি। এই কারণে আসামের মাটিতে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদ বা উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের একটা রূপ বার বার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। হিন্দু বাঙালিদের বিরুদ্ধে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল। তার পরে তার প্রকাশ ঘটেছে অভিবাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

সঠিক পথে সঠিক নেতৃত্বে সংগ্রামই প্রকৃত ভারতীয় নাগরিককে বিদেশি বানানোর চক্রান্ত প্রতিহত করতে পারে

এই অবস্থায় রাজ্যের সকল অংশের জনগণকে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা ধরাবার চেষ্টা করেছি, তা হচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, উন্নয়ন ও বেকার সমস্যা ইত্যাদি জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো নিয়ে অসমীয়াভাষী অঞ্চলে আন্দোলন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হচ্ছে না। বাংলাদেশি ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করে জনাকয়েক নেতা লক্ষ লক্ষ টাকা কামালেন। কিন্তু গরিব অসমীয়াভাষী মানুষ আরও গরিব হয়ে গেল। এই অবস্থারই চূড়ান্ত পরিণামে রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রকাশ ঘটল। এই পথে গিয়ে ১২ হাজার অসমীয়া যুবক মিলিটারির বুলেটের সামনে বুক পেতে দিল। এই ১২ হাজার যুবককে এই পথে ঠেলে দিয়ে আসামের কী উপকার হল? তাদের আদর্শ ঠিক ছিল না, ভুল নেতৃত্বে লড়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু তাদের দেশপ্রেম ছিল না একথা বলা যাবে না। তাই যে কথাটা বেরিয়ে আসছে তা হল, সঠিক নেতৃত্বে সঠিক দাবির ভিত্তিতেই লড়তে হবে। আজ চারিদিকে ষড়যন্ত্রের মাঝে দাঁড়িয়ে সংখ্যালঘু জনগণকেও এই কথাগুলো বুঝতে হবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে হিন্দু ধর্মাবলম্বী গরিব মানুষকে বন্ধু হিসাবে বিবেচনা করে লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি করতে হবে। মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই। পশ্চিমবঙ্গে বিদেশি অভিযোগে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এভাবে জেরবার করার হিম্মত সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর হচ্ছে না। তার অন্যতম কারণ হল, স্বাধীনতা আন্দোলনের দিন থেকেই পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী চিন্তাভাবনার চর্চা চলছে। বিগত ৩৩ বছর সিপিএম ক্ষমতায় থেকে পুঁজিপতিদের সেবা করে এবং ফ্যাসিস্ট কায়দায় গণআন্দোলন দমন করেও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার সবটা নষ্ট করতে পারেনি। এই বামপন্থার নির্যাস হল, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ১৯৪০-৪২ সাল থেকে আসামে সিপিআই কাজ করছে। তারপর সিপিএমও এসেছে। কিন্তু তারা কেউই উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের গায়ে হাত দেয়নি। ভোটের লোভে প্রতিনিয়ত প্রাদেশিকতাবাদীদের সঙ্গে আপস করে চলেছে। তাই রাজ্যের সকল অংশের জনগণকে উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রকৃত বামপন্থার ভাবধারা অসমীয়া মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে পারলেই উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করা সম্ভব।

কে সংখ্যালঘুর প্রকৃত বন্ধু তা চিনতে হবে। সমস্ত সংখ্যালঘু এক হও — এই স্লোগান তুলে ১৯৮৫ সালে ইউ এম এফ-এর ১৭ জন বিধায়ক বিধানসভায় গিয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে এঁদের সবাই বিক্রি হয়ে যায়, কেউ কংগ্রেসের কাছে আবার কেউ কেউ এজিপির কাছে। ২০০৬ সালে একই স্লোগানের আড়ালে ইউ ডি এফ-এর পক্ষ থেকে ১০ জন বিধায়ক বিধানসভায় গিয়েছিলেন। এখন তাঁরা যাচ্ছেন এজিপির দিকে, যে এজিপি সংখ্যালঘুদের শান্তিতে বেঁচে থাকাটাও অসম্ভব করে তুলেছে। আসলে প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে সংখ্যালঘুদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে এই সমস্ত শক্তিগুলো। সংখ্যালঘু জনগণকে এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সঠিক নেতৃত্ব আর আদর্শের ভিত্তিতে শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া সংখ্যালঘু জনগণের বেঁচে থাকার বিকল্প কোনও পথ নেই। এই আদর্শ বুকে বহন করে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সংগ্রামী জনগণকে ঘোষণা করতে হবে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকে ভিত্তিবর্ষ করে যথার্থভাবে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে বিচার করে বিদেশি সনাক্তকরণ করতে কারও কোনও আপত্তি নেই, থাকতেও পারে না। কিন্তু বিদেশি সনাক্তকরণের নামে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিককে বিদেশি বানানোর চক্রান্তকে মেনে নেওয়া যায় না। তাই ৩ লক্ষ ৭০ হাজার 'ডি' ভোটার বানিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার বিরুদ্ধে এবং তাদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেবার দাবিতে এবং সমগ্র দেশের সাথে একই সময় একই আধারনীতির ভিত্তিতে নাগরিকপঞ্জী প্রণয়ন না করে পৃথকভাবে এবং ভিন্ন আধারনীতির উপর নাগরিকপঞ্জী প্রণয়ন করার মাধ্যমে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের বিদেশি বানানোর অভিসন্ধিপ্রসূত কার্যক্রম প্রত্যাহার করার দাবিতে জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ঐক্যের বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি। সেজন্য সংগ্রামী গণকমিটি গড়ে তুলতে হবে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এটাই সময়ের আহ্বান।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সরকারি মিথ্যাচার

একের পাতার পর

বিনিয়ন্ত্রণ করলে দাম বাড়বেই। কিন্তু বিশ্ববাজারে দাম যখন কমছে তখন বিনিয়ন্ত্রণ করলে হঠাৎ করে 'অত্যধিক' দাম বাড়াবার দায় নিতে হবে না, আবার বিনিয়ন্ত্রণ করার কাজটাও হাসিল করা যাবে। সরকারের 'অত্যধিক' দাম না বাড়ানোর নমুনা হল, পেট্রোল ও ডিজেলে লিটার প্রতি ৩ টাকা কেরোসিনে ২ টাকা আর রান্নার গ্যাসে সিলিন্ডার পিছু ৩৫ টাকা বৃদ্ধি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মুরলি দেওরা বলেছেন, এবার থেকে পেট্রোপণ্যে দাম নির্ধারণ করবে বিশ্ববাজার। বিশ্ববাজারে দাম কমলে এদেশে দাম কমবে আর বিশ্ববাজারে দাম বাড়লে এদেশে দাম বাড়বে।

দেশের সাধারণ মানুষকে ঠকাতে সরকার এই প্রচারটা এমনভাবে করছে যাতে মনে হয় দাম নির্ধারণে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল করা যেন দেশের মানুষের স্বার্থে বিরাট একটা প্রগতিশীল পদক্ষেপ। অথচ কী আশ্চর্য, দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু কোনও দিন এ দাবি তোলেনি। এই দাবিটা তুলেছে খোলা বাজারের পূজারি তথাকথিত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

এই প্রচারের পিছনে সরকারের একটা মস্তবড় চালাকি আছে। সরকার দেখাতে চায় পেট্রোল-ডিজেল-গ্যাস-কেরোসিনের দাম বাড়াতে গিয়ে সরকারকে জনরোষের সামনে পড়তে হচ্ছে, অথচ সরকার সেটা চায় না। এ বার বিনিয়ন্ত্রণ করে সরকার হাত ধুয়ে ফেলছে। এরপর দাম যা ঠিক করার বাজার করে দেবে। বাজার তো 'নিরাকার ঈশ্বর'। ফলে জনগণের কোনও অভিযোগ করার থাকবে না। এই চালাকির যুক্তি করে সরকার যে মূল সত্যটা আড়াল করছে তা হল, এ দেশে পেট্রোপণ্যের চড়া দামের আসল কারণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর চাপানো বিপুল করের বোঝা— বিশ্ববাজারের বেশি দাম নয়। পেট্রোপণ্যের দামের পিছনে সরকারের এই করের দিকটা এস ইউ সি আই (সি) দলই প্রথম জনগণের সামনে নিয়ে আসে।

গণদাবীর নানা লেখায় আমরা বহু দিন ধরে দেখিয়ে আসছি যে, এমনকী বিশ্ববাজারের সমান দাম ধরলেও ভারতে পেট্রোপণ্যের দাম চলতি দামের চেয়ে অনেক কম হয়। সেটা যে হয় না, তার কারণ সরকারি ট্যাক্স, যেটার পরিমাণ ৫০ শতাংশেরও বেশি। তেল যেহেতু অপরিহার্য পণ্য, তাই এটাকেই সরকার ক্রমাগত বর্ধিত কর আদায়ের কামধেনু বানিয়েছে।

আমরা এও দেখিয়েছি, তেল কোম্পানিগুলোর লোকসানের প্রচারটাও ধাপ্পা। ইতিপূর্বেই আমরা কোম্পানির ব্যালান্সশীট তুলে দেখিয়েছি কী বিপুল পরিমাণ লাভ তারা করে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই আমরা দেখিয়েছি, অশোধিত পেট্রোলিয়াম যেটা এ দেশে আসে তার এক কানাকড়িও নষ্ট হয় না। বহু রকম মূল্যবান পণ্য তার থেকে তৈরি করে মালিকরা লাভের গুড় ঘরে তোলে।

একই ভাবে ভরতুকির কথাও দু'দিক দিয়ে সরকারি মিথ্যাচারের নমুনা। প্রথমত, ব্যাঙ্কগুলোতে পুঁজিপতি মালিকদের খেলাপি ঋণের জন্য ব্যাঙ্কের ঘাটতি পোষাতে যে সরকার প্রায় বছর বছর দশ থেকে বিশ হাজার কোটি টাকা ভরতুকি দেয়, মালিকদের রপ্তানিতে সুবিধা ও দেশের বাজারে পণ্য বিক্রিতে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, বিক্রয় কর, উৎপাদন শুল্ক ইত্যাদি আরও নানা খাতে ছাড় দেয়, কম সুদে মালিকদের ঋণ পেতে ব্যবস্থা করে দেয়, সেই সরকারের যত সমস্যা কেবল সাধারণ মানুষের জন্য খাদ্যশস্যে ও পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস আর গরিবের কেরোসিনে ভরতুকি দিতে।

দ্বিতীয়ত, সরকার ভরতুকি দিতে হচ্ছে বলে চেঁচায় এবং ফলাও করে কত ভরতুকি দিতে হচ্ছে তা প্রচার করে, কিন্তু শুধু পেট্রোপণ্য থেকে বিপুল করের মারফত কত হাজার লক্ষ কোটি টাকা সরকার ঘরে তোলে তা কখনও বলে না। মন্ত্রীরা লোকসভা-রাজ্যসভায় নানা তথ্য জানান, তার সত্য-মিথ্যা যাই হোক, কিন্তু পেট্রোপণ্যে করখাতে কত আয় হয় তা কখনওই জানা যায় না। এটা রহস্যজনক নয় কি? সরকার নিশ্চয় কিছু গোপন করতে চায়।

এ সরকার আরও কত নির্লজ্জ দেখুন। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে রান্নার গ্যাস আর কেরোসিনে কত ভরতুকি দিতে হচ্ছে, তার ফলাও প্রচার করছে, কিন্তু এ কথাটি কখনও বলছে না যে, মন্দার অজুহাতে এবার কেন্দ্রীয় সরকার দেশের পুঁজিপতিদের নানা খাতে চার লক্ষ কোটি টাকার বেশি ভরতুকি দিয়েছে। এটা দেওয়ার ফলে স্বভাবতই এবারের বাজেটে আর্থিক ঘাটতি বিরাট অঙ্কে পৌঁছেছে। এবং যেহেতু মালিকদের 'আর্থিক সহায়তা' (স্টিমুলাস) দেওয়া চলছেই, তাই ঘাটতিও বাড়ছে ক্রমাগত। কী করে তা পূরণ হবে? পেট্রোপণ্যের কামধেনু তো আছেই। অবস্থা এমনই যে, কেরোসিনকে পর্যন্ত সরকার ছাড় দেয়নি। অথচ আজও আমাদের দেশে গরিবের ভাঙা কুটিরে সন্ধ্যায় সামান্য আলোর জন্য কেরোসিনই একমাত্র ভরসা।

আমরা এখানে দু'টি সারণী দিলাম। একটিতে কোম্পানিগুলোর লাভের পরিমাণ, অন্যটিতে বিভিন্ন দেশে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কত তা দেখানো হয়েছে। পাঠকরা পড়লেই ধরতে পারবেন সরকারি মিথ্যাচারের বহরটা।

নিচে কয়েকটি দেশের পেট্রল-ডিজেলের মূল্য উল্লেখ করা হল ঃ

দেশ	পেট্রোল (টাকা/লিটার)	ডিজেল (টাকা/লিটার)
ভারত	৫১.৪	৪০.১
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৪.৩	৩৬.৭
ইন্দোনেশিয়া	৩১.৯	৩৬.৭
পাকিস্তান	৩৫.৫৯	৩৭.৪৮
নেপাল	৪৮.৫	৩৬.৩
বাংলাদেশ	৪৯.৬৮	২৯.৫৪

নিচে কোম্পানিগুলির লাভের পরিমাণ দেওয়া হল।

- **ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ২০০৮-০৯ সালে নিট লাভ করেছে ২৯৫০ কোটি টাকা। ২০০৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত লাভের পরিমাণ ৪৬৬৩.৭৮ কোটি টাকা (কর প্রদানের পর)**
- **হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-এর ২০০৯ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লাভ হয়েছে ৫৪৪ কোটি টাকা।**
- **ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ২০০৯ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লাভ হয়েছে ৮৩৪ কোটি টাকা।**
- **রিলায়েন্সের বার্ষিক রিপোর্ট বলছে, ২০০৭-০৮ সালে তারা ১৫,৫৪৬ কোটি টাকা লাভ করেছে।**
- **সরকারি কোম্পানি ওএনজিসিও ২০০৭-০৮ সালে প্রথম ৬ মাসে ৫০৯৭.৪৮ কোটি টাকা লাভ করেছে।**

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের লাভ এত যে পরমাণু শক্তি উৎপাদনের জন্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গড়তে সমঝোতা করেছে।

(সূত্রঃ ই পি ডব্লিউ, ১৫ মে, দ্য হিন্দু বিজনেস লাইন-২৬ জুন, ২০১০)

'হুল' দিবসে কলকাতায় ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ, ডেপুটেশন

ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মারক 'হুল দিবস' ৩০ জুন আন্দোলনের মাধ্যমেই পালন করল এসসি-এসটি স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি। এসসি-এসটি ছাত্রদের স্টাইপেন্ড বছরের শুরুতেই দিতে হবে, (২) তফসিলি জাতি-উপজাতি ছাত্রদের সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতির ফলে তফসিলি জাতি-উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, তার প্রতিবাদে ঐদিন কলকাতায় মেট্রো চ্যানেলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

সকাল ১০টায় ধর্মতলায় সিধু-কানহু ডহরে স্মারক বেদিতে মাল্যদান কর্মসূচি পালিত হয়। এরপর আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী যোগেশ বর্মনের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। দাবিগুলি হল ঃ (১) চলবে না, (৩) পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিটি জেলায় স্থাপন করতে হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এসসি-এসটি আন্দোলনের নেত্রী সাবিত্রী মাহাত, ছাত্রনেতা তপন শিকারি, গঙ্গারাম হাঁসদা এবং আদিবাসী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা বিসম্বর মুড়া। এরপর বিক্ষোভ মিছিল কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে শেষ হয়।

শিক্ষা কনভেনশন

সাতের পাতার পর

গোপাল হালদার ও তুষারকান্তি দাসকে যুগ্মসম্পাদক করে ১৯ জনের আঞ্চলিক সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

২৬ জুন মথুরাপুর থানার দেবীপুর অঞ্চলে মথুরাপুর আর্য বিদ্যাপীঠ স্কুলে অনুষ্ঠিত শিক্ষা কনভেনশন পরিচালনা করেন শিক্ষা আন্দোলনের নেতা মহাদেব ঘোষ। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন শুভঙ্কর মিস্ত্রী। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জহিরুদ্দিন পাইক ও শিক্ষক তপ্তায় পাল। প্রধান বক্তা ছিলেন শিক্ষক লক্ষ্মণ মণ্ডল।

আজিজুর রহমান মোল্লাকে সভাপতি, মনোজ চক্রবর্তী ও শুভঙ্কর মিস্ত্রীকে যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ জনকে নিয়ে আঞ্চলিক সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

২৭ জুন মথুরাপুর অঞ্চলে বাপুলিবাজার নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন দুর্গাদাস বৈদ্য, মূলপ্রস্তাব পাঠ করেন আবুল কালাম পুরকাইত। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন গোবর্ধন ভাণ্ডারী, নুরুল হক দর্জি, মলয় মণ্ডল, কিংকর বৈদ্য, লক্ষ্মণ মণ্ডল। প্রধান বক্তা ছিলেন আশীষ বসু। সভাপতি দুর্গাদাস বৈদ্য, সম্পাদক আবুলকালাম বৈদ্য সহ ২৬ জনকে নিয়ে আঞ্চলিক সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বীরভূমের নলহাটিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৮ জুন এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে বীরভূমের নলহাটি শহরে বিক্ষোভ মিছিল হয়। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক এক ঘণ্টা অবরোধ করা হয়। অবরোধে কেন্দ্রের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) সংগঠক কমরেড আব্দুস সালাম।

২৯ জুলাই

গণদাবীর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে

গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

গণদাবীর গ্রাহক হোন

চাঁদা

বার্ষিক ঃ ১০৪ টাকা সডাক ঃ ১১৭ টাকা
ষান্মাষিক ঃ ৫২ টাকা সডাক ঃ ৫৯ টাকা

মালিকদের কথা শুনে ভাড়া বাড়াবেন না

পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাল যাত্রী কমিটি

পরিবহণ যাত্রী কমিটির সম্পাদক সদানন্দ বাগলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ৬ জুলাই রাজ্য পরিবহণ মন্ত্রী রঞ্জিত কুণ্ডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, ডিজেলের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে যাত্রী পিছু বাসমালিকদের ১৫ পয়সা বাড়তি খরচ হবে। দৈনিক বাস পিছু সাতশো যাত্রী হলে সেটা বড় জোর ১০৫ টাকা হয়। অথচ মালিকরা দাবি করছেন— প্রথম স্টেজেই এক টাকা ভাড়া বাড়াতে হবে। অর্থাৎ বাড়তি ৬০০ টাকা চাইছেন। এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। মালিকরা যাত্রী ও সরকারের কাছে আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করুন, যেটা তাঁরা কখনও করেন না। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার কথাও কখনও ভাবেন না। তিনি মন্ত্রীকে আরও বলেন, আসাম সরকার যদি বাস মালিকদের একতরফা ভাড়াবৃদ্ধির ঘোষণাকে বেআইনি ঘোষণা করে স্থগিত করে দিতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন মালিকদের স্বার্থে মুখর হয়। ভাড়া নিয়ে কোনও রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা ও সর্বদলীয় সভা ডাকার জন্য তিনি দাবি জানান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in